CONTAINS EXCLUSIVE BANGLA AND ENGLISH CONTENT

the ULABian

A Student Mouthpiece

জীবনজুড়ে শিল্প চাই! ● পৃষ্ঠা ৮

ইউল্যাবের শিক্ষানবিশ... ● পৃষ্ঠা ৪

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, সামার-ফল ২০২৩/স্প্রিং ২০২৪ । ৬৮৮ বেড়িবাঁধ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মানবিক মানুষের গল্প

সিবলী সাদিক সিফাত

মানবতা মানুষের এমন এক অনন্য গুণ, যা ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেয়। এ গুণ সকল মানুষের মধ্যে থাকে কি না জানা নেই, কিংবা সকলের মধ্যে থাকলেও কেউ কেউ হয়তো তার অস্তিত্ব টের পান, কেউবা পান না। আজকের এই পৃথিবীতে এ ধরনের অনন্য গুণসম্পন্ন মানুষগুলোর গল্পও মাঝেমধ্যে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অন্যায়, অপরাধ, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানির মতো অন্যায্য গল্পগুলোর মাঝে দয়া আর মানবতার গল্পগুলো যেন হারিয়ে যায়। একই সঙ্গে চোখের আড়ালে চলে যান সেই সব গল্পের রচয়িতারাও। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাঁরাই তো আমাদের সুপারহিরো। তাঁদের ত্যাগ ও কর্তব্যবোধ আমাদের অনুপ্রাণিত করে, ভরসা জাগ্রত করে। আজ এমন কয়েকজন মানুষের মানবতার গল্প আপনাদের শোনাতে চাই, যে গল্পগুলো নিশ্চয় আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে **সারাহ ইসলামের** 'ব্রেইন ডেথ' পরিস্থিতি। লাইফ সাপোর্টে চলছিল তাঁর প্রাণঘড়ি। চিকিৎসকেরা সারাহর মাকে বললেন বর্তমান পরিস্থিতি। তাঁর মা শবনম সুলতানা একমুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। তিনি বলেছেন, 'আপনারা ওর কিডনি দুটি নিতে পারেন। শুধু একটাই অনুরোধ, অকারণ যেন সময় নষ্ট না হয়।' শবনম সুলতানার বোন বললেন, 'তাহলে তো তুই ওর কর্নিয়া দুটোও দান করে দিতে পারিস।' ২০২৩ সালের ১৮ জানুয়ারি রাতে নেওয়া হলো সারাহর কর্নিয়া। ১৯ জানুয়ারি প্রথম প্রহরে নেওয়া হলো দুটি কিডনি। তারপর লাইফ সাপোর্ট খুলে নেওয়া হলো। সারাহ ইসলাম মৃত্যুর আগে তাঁর দুটি কর্নিয়া দান করে গেছেন। দুটি কিডনিও দান করেছেন। তাঁর দুটি কিডনি দুজন নারীর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে চিকিৎসার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমন ঘটনা ঘটেছে। দেশে প্রথম ব্রেইন ডেথ থেকে মৃত্যুর আগে কোনো মানুষের দান করা কিডনি প্রতিস্থাপিত হলো অন্য ব্যক্তির দেহে। জন্ম থেকেই কঠিন রোগে আক্রান্ত সারাহ ইসলাম ঐশ্বর্য মাত্র বিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও সেই দুরন্ত ত্যাগী মেয়ে সারাহর মুখে ছিল মানবতার প্রসন্ন হাসি।

হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত রোগীরা না খেয়ে আছেন, আর এদিকে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এ ছাড়া রাস্তায়ও তখন তীব্র যানজট। ভারতের বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসক **গোবিন্দ নন্দকুমার;** তীব্র যানজটে আটকে আছে তাঁর গাড়ি। কালবিলম্ব না করে রোগীদের কথা ভেবে গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গেলেন। গাড়ি রেখেই ৪৫ মিনিটে তিন কিলোমিটার পথ দৌড়ে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছে গেলেন তিনি। কর্তব্যবোধসম্পন্ন মানবিক এই চিকিৎসক ১৮ বছর ধরে বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচারে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করে চলেছেন। চিকিৎসক গোবিন্দ নন্দকুমারের এই অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণতা আর মানবিকতা রোগীদের কাছে তাঁর সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ।

রানা প্লাজার মৃত্যুকূপ থেকে আহতদের উদ্ধার করতে যখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ক্লান্ত, তখনই তাঁদের সহায়তায় ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের অনেকে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার সময় যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পরিচিত মুখ **নওশাদ হাসান হিমু**। ১৭ দিনের উদ্ধার অভিযানে অসংখ্য মানুষ এবং বেশ কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার করেন তিনি। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মানুষগুলোর ডাকে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, হিমু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ ঘটনার পর কয়েক বছর ধরে মানসিক অবসাদে ভোগেন তিনি। এরপর এক রাতে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন হিমু। যখন তিনি ধ্বংসস্তূপে আটকে যাওয়া একের পর এক অসহায় মানুষকে উদ্ধার করে আনছিলেন, অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল সারা দেশ। কিন্তু নওশাদ হাসান হিমুর শরীরে জ্বলতে থাকা আগুন যেন চোখ এড়িয়ে গেল সবার। খেটে খাওয়া শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা আদায়ের জন্য দুঃসাহসী এই মহান বীরের আত্মত্যাগকে আমরা কতটুকু মর্যাদা দিতে পেরেছি?

সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক **মো. আমজাদ আলী** নিরলসভাবে যাত্রী বহন করে চলেছেন। তাদের পৌঁছে দিচ্ছেন বিভিন্ন গন্তব্যে, কিন্তু সপ্তাহের কোনো এক দিনের পুরো রোজগারের একটি টাকাও তিনি সংসারের জন্য খরচ করেন না। ২০১৯ সাল থেকে প্রতি শুক্রবার অটোরিকশা চালিয়ে যা আয় করেন, তা দিয়ে বিভিন্ন মানুষের সেবা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অবিরত। প্রায় ১৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার কিনে দেওয়ার পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছেন মানবতার স্বার্থে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নয়; চলতি পথে যদি কারও ভাড়া দেওয়ার সক্ষমতা না থাকে, তিনি তাকেও বিনা ভাড়ায় গন্তব্যে পৌঁছে দেন। অভুক্ত মানুষকে খাবার কিনে দেন নিজের কথা চিন্তা না করেই। আমজাদ আলী বললেন, 'আমি গরিব মানুষ, অটোরিকশা চালাই, তবু মনটা চায় মানুষের জন্য কিছু করি।'

বয়স ৮০ ছুঁই ছুঁই ব্রিটিশ নারীর অন্তিম ইচ্ছা, শেষ নিদ্রাও

> বাকি অংশ পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

ইবতেশাম চৌধুরী

গত নভেম্বরের কোনো এক সকালে হাঁটতে বের হয়েছি। কমলাপুর রেলস্টেশনের ওভারব্রিজে হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল উস্কখুস্ক চুল আর ময়লা জামা পরা এক মেয়ের দিকে। হাতে ভিক্ষার থালা। চোখ দুটো নিস্তেজ। কী মনে করে এগিয়ে গেলাম তার সঙ্গে কথা বলতে। প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করল। আমি শুনতে থাকলাম তার জীবনের গল্প।

নাম স্বপ্না। বয়স ১৬। বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে। বাবা সিরাজ মিয়া ছিলেন একজন কৃষক। ৫ ভাই-বোনের মধ্যে স্বপ্না মেজ। স্বপ্না জানাল, স্কুল থেকে আসার পরপরই সরাসরি চলে যেতাম ফসলের খেতে; বাবাকে সাহায্য করতে। বাবা বলতেন, তুই আমার মেয়ে না, আমার ছেলেও।

ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাবার আদর পেয়েছে সে। কথার এক ফাঁকে স্বপ্না বলল, 'আমার ছবি আঁকতে খুব ভালো লাগত। শহর থেকে আসার সময় যেদিন বাবা আমার জন্য ড্রইং খাতা নিয়ে আসতেন, সেদিন সারাটা সময় বসে আঁকিবুঁকি করতাম সেই খাতায়। আজ কত দিন ধরে ছবি আঁকি না। আর আঁকবোই-বা কীভাবে! এখন তো চোখে দেখি না।'

দরিদ্র পরিবারের কন্যা স্বপ্নার স্বপ্ন ছিল, একদিন বড় পদে চাকরি করবে। কিন্তু ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ই তার সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। টাইফয়েডের ভয়ংকর থাবায় হারিয়ে গেছে দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি। স্বপ্না বলে, 'বাবা হাল ছাড়েননি। টাকা জমাতে লাগলেন আমার চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এক ঝড়ের রাতে বাবাও মারা যান। সংসারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে স্বপ্নাদের পরিবারের সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর এক বছরের মাথায় আরেকজনকে বিয়ে করেন মা। সৎবাবার সংসারে টিকতে না পেরে আমরা ভাই-বোনেরা চলে এলাম ঢাকায়; বুড়ো নানির কাছে। পেটের দায়ে আমি নেমে পড়ি ভিক্ষার কাজে। নিজে পড়ালেখা করতে না পারলেও এখন ভাই-বোনদের পড়াশোনা করাচ্ছি। দোয়া করবেন, আমার বড় বোন আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ওর ইচ্ছে পুলিশ হওয়ার। আমি আমার বোনের ইচ্ছা পূরণ করবই।'

নিজের স্বপ্নপূরণের সংগ্রাম থেমে থাকেনি তার। ডাক্তার তাকে বলেছেন, চোখের চিকিৎসার জন্য সত্তর হাজার টাকা লাগবে। সেই টাকাও একটু একটু করে জমাচ্ছে সে। স্বপ্না আরও বলেছে, চোখ ভালো হয়ে গেলে আবার পড়াশোনা শুরু করবে। লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করবে। ভিক্ষা করতে তার মোটেও ভালো লাগে না।

কথা বলতে বলতে একটু লাজুক সুরে বলল, 'আমার প্রতিবেশী সায়েদ কয়েক বছর আগে বিদেশে গেছে। সে বলেছে, দেশে ফিরেই আমাকে বিয়ে করবে। ভাই বোনেরা বলে, বিয়ের পর আমি নাকি পর হয়ে যাব।'

এভাবে স্বপ্নার সংগ্রামের গল্প শুনতে শুনতে অনেকটা সময় চলে গেল। উপলব্ধি করলাম, তার জগৎটা আসলে অন্ধকার নয়; ভেতরে রয়েছে আলাদা এক পৃথিবী। যেখানে সে লালন করছে অনেক রঙিন স্বপ্ন। দৃষ্টি ফিরে পাক স্বপ্না। পূরণ হোক তার লালিত স্বপ্ন।

তাহসীন ইরতিজা ও ফয়সাল মাহমুদ

বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় ভিন্ন কিছু করার চিন্তা করলে, তার আগে আমাদের নানা সীমাবদ্ধতার কথা ভাবতে হয়। এ কারণেই কোনো কিছুর উদ্যোগ নিতে বেশ বেগ পেতে হয় এবং এই উদ্যোগ যদি কেউ ছাত্র অবস্থায় নেওয়ার কথা ভাবে। একদিকে যেমন উদ্যোগ গ্রহণের অর্থনৈতিক ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি তাকে মুখোমুখি হতে হয় নানা রকম সামাজিক প্রতিবন্ধকতার। তবে আজকাল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তরুণদের মধ্যে একধরনের মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং তারা বেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের পরিচয় তৈরি করছে।

ছাত্রজীবনে উদ্যোক্তা হওয়া নিছক কোনো স্বপ্ন নয়, বরং অনেকে আজকাল পড়াশোনার পাশাপাশি একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করছে। এতে করে তাদের নিজেদের সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান সময়েও বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে ছাত্রজীবনে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রায়ই ছোট করে দেখা হয়। এই ধারণা অনেক সময় নেতিবাচক মানসিকতা থেকে আসে। মনে করা হয়, ছাত্রদের কেবল পড়াশোনার দিকেই মনোযোগী হওয়া উচিত। তবে বর্তমান বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এই মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রজীবনেই উদ্যোগ গ্রহণ করে

> বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়। কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' পরিবারের একজন। এমনটি ভেবে থাকলে আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

theulabian@ulab.edu.bd

মানবিক মানুষের...

> পৃষ্ঠা ১ এর পর

যেন হয় বাংলার মাটিতে। তিনি **জিলিয়ান এম রোজ**। প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে বাংলাদেশে থাকছেন। তিনি কথা বলেন বাংলায়। এমনকি গায়ের পোশাকেও যেন ধারণ করেছেন এ দেশের সংস্কৃতিকে। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মানুষের কাছে তিনি পরিচিত সিস্টার রোজ নামে। নার্স হিসেবে চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র মানুষজনকে। ১৯৬৪ সালে ২৫ বছর বয়সে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে এ দেশে এলেও একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসাসেবার কাজে। ১৯৮১ সালে নার্স হিসেবে মুজিবনগরের বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে যোগ দেন। তিনি তাঁর মানবিকতার দিকগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে। প্রচারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তিনি শুধু নিজের কাজটা করে যেতে চান। একটি দেশে এত বছর মানবতার প্রচারের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলেও মেলেনি নাগরিকত্ব। এ নিয়েই যেন জিলিয়ান এম রোজের আক্ষেপ। মানবতার দিকগুলো যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে সিস্টার রোজ থাকবেন মানবতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

প্রতিবছরের মতো গত বছরও প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির মালবাজারে। হঠাৎ করে প্রতিমা বিসর্জনের আনন্দ ভেসে যেতে থাকে আচমকা তীব্র স্রোতে, ভেসে যেতে থাকে নারী-পুরুষ, শিশুসহ সকলে। এমন পরিস্থিতিতে জীবনের কথা না ভেবে এবং পরিবারের সব দায়িত্ব ভুলে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু পাড় থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন **মুহাম্মদ মানিক**। ডুবতে থাকা মানুষগুলোকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি। বেশ কয়েকজন মানুষকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। এত ওপর থেকে মানিক লাফ দেওয়ার পর পা কেটে যায়, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের রুমাল দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকা ক্ষতস্থান ঢেকে আবারও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। গ্রিল ওয়েল্ডিংয়ের কারিগর হিসেবে কাজ করেন মানিক। তিনি বলেন, 'ভালো সাঁতার জানি। তাই আমার মৃত্যুভয় তেমন ছিল না। এ ছাড়া তখন আমার মাথায় শুধু একটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল, মানুষগুলোকে যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে।'

দ্য ইউল্যাবিয়ান দল: প্রধান উপদেষ্টা: প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো, পিএইচডি, **উপদেষ্টা সম্পাদক:** বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, **উপসম্পাদকীয় সমন্বয়ক:** নিশাত তাসনিম জেসিকা
সহযোগী দল: মাহযাবীন ইউসুফ, মো. রাশেদ, রুহামা আন নাবা, রাহাত সরকার অর্জন, আকাশ কর্মকার, মন্দ্রিলা ম. হুদা, ইমতিহান আলম, সাকিব বিন রশীদ
নকশা ও অলংকরণ: 'দ্য ইউল্যাবিয়ান ডিজাইনার টিম'

খবরের ছবি

আকাশ কর্মকার ও আব্দুল্লাহ আল যুনায়েদ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ এডুকেশন ফোরাম-২০২৩। বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে। ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রেসিডেন্ট ড. কাজী আনিস আহমেদের নেতৃত্বে ইউল্যাবের একটি প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেয়। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অধ্যয়নরত অনাবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন। ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

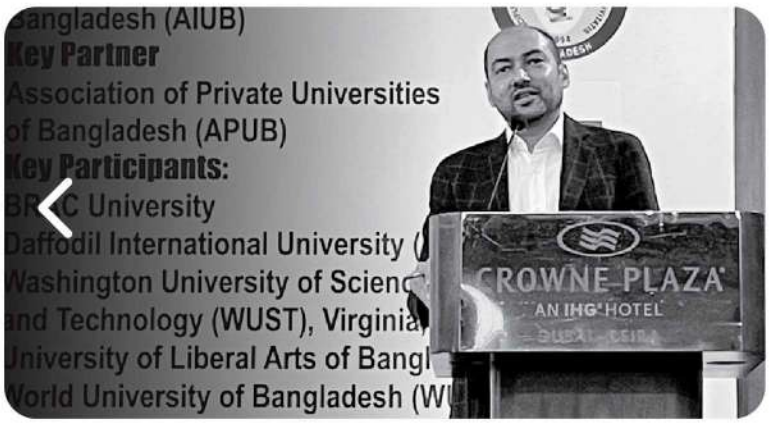

ইউল্যাব ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে সম্পন্ন হলো নবম ইন্টার-ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কনফারেন্স অ্যান্ড কালচারাল কম্পিটিশন। ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটাং, বাংলাদেশের সহযোগিতায় অক্টোবর ১৯ ও ২০, ২০২৩-এর এই আয়োজনে দেশের ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা 'জেন্ডার: দ্য বাইনারি অ্যান্ড বিয়ন্ড' শিরোনামের মূল বিষয়বস্তু ঘিরে তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সৃজনশীল কর্ম উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাঁদের মেধা, সৃজনশীলতা এবং অভিনব ধারণাকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন।

সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ইউল্যাব 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব পাবলিক রিলেশনস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট'-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও জাস্টিন গ্রিনকে 'ভিজিটিং প্রফেসর অব প্র্যাকটিস' উপাধি দেওয়া হয়। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স সুইজারল্যান্ডভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য বিশ্বের সব পাবলিক রিলেশনস পেশাদারকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে সদস্যদের পেশাদারত্বের মান বৃদ্ধি করা। ইউল্যাবে জাস্টিন গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়টির মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের 'ব্রডকাস্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া স্টুডিও'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ইউল্যাব টিভি ও ইউল্যাব রেডিও ক্যাম্পবাজকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (ডিআইএমএফ)-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'সিনে কার্নিভ্যাল-২'। ইউল্যাব ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে ফেব্রুয়ারি ১২ থেকে ১৪, ২০২৪-এর বর্ণময় আয়োজনে শিক্ষার্থীরা উপভোগ করেন নাগরদোলার মতো বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্য। ডিআইএমএফ ইউল্যাব মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের একটি আউটরিচ কার্যক্রম।

নাচে-গানে আর রঙে রঙে ইউল্যাবে আয়োজিত হলো এবারের বসন্ত উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়টির স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিসের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতি ক্লাবের বিভিন্ন পরিবেশনায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ফাগুনের রঙের এই ছোঁয়া সারা বছর যেন ইউল্যাব ক্যাম্পাসে বিরাজ করে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ হলো দিনব্যাপী এই উৎসব।

শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে

ইউল্যাবের শিক্ষানবিশ কার্যক্রম

মো. শিহাব শাহরিয়ার ও মাইনুল ইসলাম

এখন সবচেয়ে প্রচলিত একটি কথা হলো শিক্ষিত বেকার। কিন্তু কীভাবে এই 'শিক্ষিত বেকার' ধারণার উৎপত্তি হলো? প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় চোখ বোলালেই জানা যায়, দক্ষ কর্মীর অভাবে উদ্যোক্তারা তাদের দক্ষতানির্ভর কাজে শূন্যপদ পূরণ করতে পারছেন না। বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মী এনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন চালু রাখতে হচ্ছে। ইউল্যাব (ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ) যেন এই অপূর্ণতাকে পূরণ করতেই তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষানবিশ কার্যক্রমগুলো চালু করে। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে শিক্ষানবিশ কার্যক্রমগুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট এই প্রোগ্রামগুলো পরিচালনা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর জুড উইলিয়াম হ্যানিলো বলেন, শিক্ষা গ্রহণ শুধু শ্রেণিকক্ষেই নয়, ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষানবিশ কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

ইউল্যাবে বর্তমানে সাতটি শিক্ষানবিশ কার্যক্রম রয়েছে। দ্য ইউল্যাবিয়ান, রেডিও ক্যাম্পবাজ, সিনেমাস্কোপ, ইউল্যাব টিভি, পিআরফরইউ, শাটারবাগস ও ইউল্যাব অ্যানিমেশন স্টুডিও।

মিডিয়া, চলচ্চিত্র এবং জনসংযোগ অধ্যয়নের সঙ্গে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা একজন বিশেষজ্ঞের

নতুন সেমিস্টার, তাই প্রতিটি শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের মতো দ্য ইউল্যাবিয়ানেও পড়েছে নতুন সদস্য সংগ্রহের ধুম

কণ্ঠশৈলী ও উপস্থাপনার নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলে ইউল্যাব রেডিও ক্যাম্পবাজের আয়োজনে

কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে তাদের প্রস্তুত করা হয় ভবিষ্যতের জীবনের জন্য।

বর্তমানে চাকরির বাজারে কিংবা উদ্যোক্তারা কাজ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তির খোঁজ করেন। সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে প্রথম চাকরি পেতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রথম কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার এই অপূর্ণতাই পূরণ করে এই শিক্ষানবিশ কার্যক্রমগুলো। শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শিখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে, যা তাদের গ্র্যাজুয়েশনের পরে প্রথম চাকরি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

ইউল্যাবের প্রথম শিক্ষানবিশ কার্যক্রম **দ্য ইউল্যাবিয়ান** (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১০) শিক্ষার্থীদের প্রিন্ট মিডিয়ায় কাজের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে, যেন তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পত্রপত্রিকার সাংবাদিকতায় যুক্ত হতে পারে। প্রোগ্রামে যুক্ত শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকতার কলাকৌশল হাতে-কলমে শেখার মাধ্যমে তাদের লেখার ও চিন্তার মানোন্নয়ন করতে পারে। প্রতিটি একাডেমিক সেমিস্টারে একটি দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ বের হয়। দ্য ইউল্যাবিয়ান ভবিষ্যৎ সাংবাদিক ও গল্পকারদের সঠিক পরিচর্যা করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে। দেশ ও জাতির জন্য নৈতিক এবং দক্ষ সাংবাদিক গড়ে তোলাই লক্ষ্য ইউল্যাবিয়ানের।

শিক্ষার্থীদের রেডিওতে কাজ করার প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে **ইউল্যাব রেডিও ক্যাম্পবাজ** (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১১)। রেডিওতে যারা আর জে (রেডিও জকি) হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাদের জন্য রেডিও ক্যাম্পবাজ এক অনন্য সুযোগ করে দিয়েছে তাদের এই স্বপ্ন পূরণ করার ক্ষেত্রে। এ ছাড়া রেডিওতে প্রোগ্রাম পরিচালনা, গ্রাফিকস, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, নিউজ পরিচালনার কাজগুলো শিখতে সাহায্য করবে রেডিও ক্যাম্পবাজ। বাংলাদেশের প্রথম ক্যাম্পাসনির্ভর রেডিও স্টেশন এই রেডিও ক্যাম্পবাজ।

তরুণ ফিল্মমেকার জয়ন্ত কুন্ডু বলেছেন, **সিনেমাস্কোপ** (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১২) থেকে অর্জিত সিনেমা-সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি পরিচালনা দক্ষতা, নেতৃত্ব দক্ষতা, দলগত কাজের অভিজ্ঞতা তাকে বর্তমানে ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে শুট পর্যন্ত সব কাজ সহজ করে দিয়েছে; যা তাকে সিনেমার জগতে অস্তিত্ব প্রকাশে সাহায্য করে চলেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ডিপার্টমেন্টের চলচ্চিত্রে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সিনেমা শিক্ষাও আসছে এখান থেকে।

শিক্ষার্থীদের সিনেমা বানানোর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করে যাচ্ছে সিনেমাস্কোপ। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও নান্দনিকতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সিনেমাস্কোপ পরিচালিত হচ্ছে। স্ক্রিনিং দল, কর্মশালা দল, গবেষণা ও প্রযোজনা দল– এই চারটি দল মিলে সিনেমাস্কোপের সব কার্যক্রম পরিচালনা করে। সিনেমাস্কোপ এমন একটি দল তৈরি করতে চায়, যা দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিতে কাজ করবে।

দেশের প্রথম ক্যাম্পাসভিত্তিক টেলিভিশন **ইউল্যাব টিভি**

সিনেমা নির্মাণের নানা কৌশল সম্পর্কে হাজারো জিজ্ঞাসা নিয়ে কর্মশালায় হাজির সিনেমাস্কোপের সদস্যরা

স্বপ্নটা সংবাদকর্মী হওয়ার। আর তাই একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক শাকিল আহমেদকে পেয়ে প্রশ্নের ঝাঁপি খুলে বসেছিল ইউল্যাব টিভির এক সংবাদকর্মী।

প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালে। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে সক্রিয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনশীল মিডিয়ার জন্য দক্ষ ও পেশাদার সাংবাদিক গড়ে তোলাই ইউল্যাব টিভির উদ্দেশ্য। ইউল্যাব টিভির একজন সদস্য দ্বীন মোহাম্মদ সাব্বির বলেন, 'আমার পঞ্চম সেমিস্টার চলার সময় দেশের অন্যতম মিডিয়া হাউসে চাকরির সুযোগ পাই শুধু ইউল্যাব টিভিতে করা আমার রিপোর্টগুলো দেখিয়ে।' ইউল্যাব টিভির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিউজ স্ক্রিপ্টিং, ক্যামেরা পরিচালনা, ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক ডিজাইনিং, প্রোগ্রাম তৈরি, ডিজিটাল স্টোরি তৈরি, মোবাইল সাংবাদিকতা, হোস্টিং, লাইভ রিপোর্টিং ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে; যা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির বাজারে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে। এ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরাও টেলিভিশনে কাজ করার স্বপ্নকে সত্যি করতে ইউল্যাব টিভিতে প্রশিক্ষণ নেয়। ইউল্যাব টিভির বর্তমান সদস্য সাগুফতা আফরোজ জানান, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও ইউল্যাব টিভিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জন করে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নকে সত্যি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

জনসংযোগ পুরোপুরি দক্ষতানির্ভর একটি পেশা। **পিআরফরইউ** (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৬) শিক্ষার্থীদের এই জনসংযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং প্রতিযোগিতামূলক কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করে যাচ্ছে। যোগাযোগ কৌশল, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রেস ও মিডিয়া পরিচালনা, জনসমক্ষে কথা বলার দক্ষতা, উপস্থাপনা বিষয়গুলোতে দক্ষ করে তুলছে এই শিক্ষানবিশ কার্যক্রম। প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রের নিয়মগুলো শিক্ষাজীবনেই রপ্ত করতে পারছে পিআরফরইউ এর সদস্যরা।

স্থিরচিত্র বা ছবি তোলাও যে পেশা হতে পারে, তা কয়জনই-বা ভাবেন। ছবি তোলার শিল্পকে সব সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শখের গণ্ডিতেই রাখা হয়েছে। ইউল্যাবের শিক্ষানবিশ কার্যক্রম **শাটারবাগস ইউল্যাব** (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৮) শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা পরিচালনা, ছবি তোলার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলো শিখিয়ে থাকে। শাটারবাগসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দক্ষ ফটোগ্রাফার হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। ফটোগ্রাফারদেরকে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করা, ফটোগ্রাফি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করছে এই কার্যক্রম। শাটারবাগসের একজন সদস্য সাদিদ আহমেদ সাফিন জানান, ফটোগ্রাফি- সম্পর্কিত বিষয়গুলো সে শাটারবাগস থেকে বিস্তারিত জানতে পেরেছে এবং তার শখের ফটোগ্রাফি নিয়ে সে এখন তার ক্যারিয়ার ভাবছে।

সামনেই বড়সড় একটা অনুষ্ঠান; যার আয়োজনের দায়িত্ব বর্তেছে পিআরফরইউ-এর কাঁধে। তাই সদস্যদের মাঝে ইভেন্ট-সংক্রান্ত দায়িত্ব বণ্টন করে দিচ্ছে পিআরফরইউ-এর দুই সদস্য।

ইউল্যাব অ্যানিমেশন স্টুডিও (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৮) শিক্ষার্থীদের অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরিতে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করছে। অ্যানিমেটেড টিভি সিরিজ, শর্ট ফিল্ম কীভাবে তৈরি করা যায়, তা হাতে-কলমে শিখতে পারছে শিক্ষার্থীরা। এর মাধ্যমে অ্যানিমেশন ফিল্ম জগতে নিজেদের যোগ্যতায় অবস্থান করে নিতে পারবে ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরা।

মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের কো-অর্ডিনেটর নন্দিতা তাবাসসুম খান জানান, ইউল্যাব চেয়েছিল, এর কার্যক্রম শুধু শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করবে না। শিক্ষার্থীরা যেন হাতে-কলমে শিক্ষা অর্জন করে পেশাদার জায়গায় স্থান করে নিতে পারে। তিনি আরও জানান, ইউল্যাবের এই উদ্দেশ্যগুলোর বেশির ভাগ অর্জিত হয়েছে এবং শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত অনেক শিক্ষার্থী এখন মিডিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত। ইউল্যাবের এমএসজে ডিপার্টমেন্টের শিক্ষানবিশ কার্যক্রমগুলো ইউল্যাবের শিক্ষার্থীদেরকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিখতে সাহায্য করে, যা ইউল্যাবের এমএসজে ডিপার্টমেন্টকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগগুলো থেকে আলাদা করে তুলেছে।

আলোকচিত্রীর বাউণ্ডুলে অভ্যাসটাকে পুঁজি করে শাটারবাগস প্রায়সই আয়োজন করে ফটোওয়াক। সাম্প্রতিক ফটোওয়াকে চলার পথে হঠাৎ দেখা প্রখ্যাত আলোকচিত্রী জিএমবি আকাশের সঙ্গে।

জীবনজুড়ে শিল্প...

> পৃষ্ঠা ৯ এর পর

এগোতে পারলাম না। চারুকলায় পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হলাম। পড়ে গেলাম আবার চরম হতাশা ও বিষণ্নতায়। আম্মু আমার এই অবস্থা দেখে তখন মানসিকভাবে আমাকে সহায়তা করেছিল। আম্মু বলেছিল ছবি আঁকা নিজের মতো চালিয়ে যেতে। শুধু চারুকলায় পড়লেই যে ভালো ছবি আঁকা যায় এমনটি নয়।

এখন আমি ইউল্যাবে অধ্যয়ন করছি; পাশাপাশি ছবি আঁকা চালিয়ে যাচ্ছি। একটি হোম ডেকর কোম্পানিতে ফ্রিল্যান্সার আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি। এ ছাড়া ফেসবুকে আমার একটি আর্ট পেজ রয়েছে, নাম 'প্রনতি'স ক্রিয়েশন'। যেখানে বিভিন্ন শিল্পকর্ম বিক্রি হয়। অর্ডার অনুযায়ীও বিভিন্ন শিল্পকর্ম বানিয়ে দেওয়া হয়।

চারুকলায় পড়তে পারিনি ঠিকই, তবে আমি থেমে নেই। চালিয়ে গেছি শিল্পচর্চা। ইচ্ছা, আজীবন তা চালিয়ে যাবার। জীবনে আর কোনো বাধা আমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। জীবনের এখন সব থেকে বড় ইচ্ছা, একদিন আমার অনেক বড় একটি আর্ট স্টুডিও হবে।

'শুধু চার দেয়ালের ভেতর নয়, ড্রইং খাতার পাতায় নয়, আমার জীবনজুড়ে শিল্প চাই!'

জাপানিরা যেখানে আলাদা

আবু সালেক আল মাসরুফ

ছবি: এসবিএস নিউজ

'জাপান' প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব কোলঘেঁষা একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ভাবনার ডালপালাগুলো প্রসার করলেই জাপানের আর কী কী পরিচয়ে আমাদের জানা, তার সম্ভাব্য উত্তরগুলো পাওয়া যায়। জাপান নামটি শুনলেই আমাদের মানসপটে যে চিত্র প্রতিফলিত হয়, তা হলো প্রযুক্তি খাতে আকাশচুম্বী, টেকসই সাফল্য এবং মহানুভবতা, শিল্প-সংস্কৃতির অপার মেলবন্ধনের এক অন্যতম ধারক ও বাহক। জাপানি মানুষদের দায়িত্বশীলতা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, সমান্তরালে বিনয়ের সংস্কৃতি জাপানকে বিশ্ব দরবারে স্বতন্ত্র মাত্রায় পরিচয় করিয়ে দেয়। জাপানি গাড়ি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেভাবে আমাদের জীবনে বিস্মিত করেছে, গতিময়তা এনেছে; ঠিক তেমনি সাম্প্রতিক সময়ে জাপানিদের এক কর্মযজ্ঞ আমাদেরকে আন্দোলিত ও উদ্বেলিত করেছে। আমাদের জানা আছে কী সেই কর্মযজ্ঞ, যা জাপানকে বিশ্বের কাছে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এবার আসুন, জেনে নিই কী সেই কর্মযজ্ঞ।

ফুটবল বিশ্বকাপ খেলার মধ্য দিয়ে নিজ দেশের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখা যায়। বিশ্বকাপে খেলা ছাপিয়ে নিজ দেশকে ভিন্ন উপায়ে তুলে ধরে গৌরব বয়ে আনা যায় এমন কোনো নজির ফুটবল ইতিহাসে ছিল কি না বা কেউ দেখেছে কি না, তা আমার জানা নেই। তবে এবার কাতার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে এমন একটি দেশকে দেখেছি, যারা খেলার বাইরেও নিজেদের সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে আলোচনায় এসেছে এবং অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। সেই দেশটি হলো এশিয়া মহাদেশের ঝান্ডা ওড়ানো জাপান। এবার মনে কৌতূহল জাগতে পারে, বিশ্বকাপে খেলার বাইরেও কীভাবে বিশ্ববাসীর কাছে নিজ দেশের উপস্থিতি জানান দেওয়া যায়। কাতার বিশ্বকাপে সেই অভাবনীয় কাজটিই করে দেখিয়েছে জাপান। বিশ্বকাপ ফুটবলে স্টেডিয়াম ও ড্রেসিংরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে জাপান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছে। খেলা শেষে ড্রেসিংরুম ও স্টেডিয়াম পরিষ্কার করা জাপানি খেলোয়াড় ও ফুটবলপ্রেমীদের কাছে নতুন কোনো ঘটনা নয়। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে এ কাজ করে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বাহবা কুড়ান এই দ্বীপরাষ্ট্রের ফুটবলার ও সমর্থকেরা। রাশিয়া বিশ্বকাপে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় উদাহরণ তৈরি করা জাপানিরা সেই বিশ্বকাপের ফেয়ার প্লের পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। রাশিয়া বিশ্বকাপের পরম্পরায় সর্বশেষ ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপেও জাপানি খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুম পরিষ্কার করে আলোচনায় এসেছেন এবং জাপানি সমর্থকেরা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে নতুন সুরের উল্লাসে বিশ্ববাসীকে আন্দোলিত করেছেন, জাগ্রত করেছেন। নিজ দেশের কিংবা ভিনদেশের খেলা– জাপানিরা স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে তবেই মাঠ ছেড়েছেন। কাতার ও ইকুয়েডরের মধ্যকার ম্যাচে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ সমর্থক যখন খেলা শেষ হতে না হতেই মাঠ ছেড়ে চলে যান, তখন একদল জাপানি সমর্থক স্টেডিয়ামে অবস্থান করছিলেন ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য। এমনকি নিজ দল জাপান, জার্মানির বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়ের পর শুধু বিজয়োল্লাসে ব্যস্ত না হয়ে খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে অন্য এক সুরের উদ্‌যাপনে মেতে উঠেছিলেন তাঁরা। বেলজিয়ামের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে হারও তাঁদের এ কর্মকাণ্ডে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। ম্যাচ জয়ের উদ্‌যাপনে কিংবা পরাজয়ের বিষণ্ণতায়ও স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে মাঠ ছাড়ার ঘটনা জাপানিদের জাতিগত শৃঙ্খলার উৎকর্ষকেই নির্দেশ করে।

জাপানিদের এ কর্মযজ্ঞ হঠাৎ করেই হয়নি। এর পেছনে রয়েছে জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা ও ধর্মীয় বিশ্বাস। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্কট নর্থের মতে, 'জাপানিদের এসব কাজ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান– সবখানেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মনোভাব তৈরির জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। বারো বছরের শিক্ষাজীবনে স্কুল, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করার অভ্যাস শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করে ফেলে।' অধিকাংশ জাপানিই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মে পরিচ্ছন্নতাকে আধ্যাত্মিক বিষয় বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া 'আ হিস্টোরি অব জাপানিজ রিলিজিয়ন' বইটি পড়ার পর আমি জানতে পারি, বৌদ্ধধর্মের আগে থেকেই জাপানিদের একটি নিজস্ব ধর্ম আছে 'শিন্তো', যার মর্মবাণীই হলো পরিচ্ছন্নতা। শিন্তো ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য ও বৌদ্ধধর্মের সম্মোহনী বার্তাকে লালন করেই জাপানিরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন।

জাপানিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সংস্কৃতির চর্চা আমাদের জন্য এই সময়ে এসে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক। ঢাকা আমাদের প্রাণের শহর। কিন্তু নিজেকে যেভাবে ভালোবাসি, এই শহরটাকে কি ঠিক সেভাবেই ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পেরেছি– প্রশ্ন থেকেই যায়। এই শহরের প্রতি যদি ভালোবাসা থেকেই থাকে, তাহলে কেনই-বা যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা, প্লাস্টিক পণ্য, বোতল যেখানে খুশি সেখানে ফেলা, নির্মাণসামগ্রী রাস্তায় খোলা অবস্থায় রাখাকে আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত করেছি। আমরা কখনোই অনুধাবন করি না আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোই আমাদের চারপাশের পরিবেশটাকে বিবর্ণ ও মলিন করে দিচ্ছে। আমাদের প্রাণের শহর ঢাকার চারপাশেই শুধু সজীবতার শূন্যতা আর দূষিত বাতাসের ছড়াছড়ি। একসময়ের প্রাণোচ্ছল ও লাবণ্যময় ঢাকা আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। চায়ের কাপে কিংবা খবরের পাতায় যখন ঢাকা শহরের নাজুক পরিবেশের কথা শুনি এবং দেখতে পাই, তখন কেবল আমরা এই শহরকেই দায়ী করি। কিন্তু কখনো কি এর পেছনে আমাদের দায়কে অভিযুক্ত করি? অপ্রিয় হলেও সত্য, আমরা কখনোই নিজেদের দায়কে স্বীকার করি না।

প্রাণের এই শহরকে ছাড়া আমাদের দেশ প্রায় স্থবির। রাজনীতি থেকে অর্থনীতি কিংবা শিক্ষা থেকে চিকিৎসা– সব ক্ষেত্রেই এই শহরের ব্যাপক পদচারণ। এই শহরকে বাসযোগ্য করে তুলতে জাপানিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সংস্কৃতি আমাদের জন্য হতে পারে আদর্শ। বিশ্বকাপের এই বিশাল কর্মযজ্ঞে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও জাপানিরা এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে এই বার্তাই দিয়েছে, চাইলেই নিজ দেশ ছাপিয়ে ভিন দেশেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নেমে পড়ে ব্যক্তি উদ্যোগেই আশপাশের পরিবেশটাকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে আত্মিক বিষয়ে রূপান্তর করা জাপানিরা নিজ দেশে এ সংস্কৃতি বাস্তবায়ন করে তা ভিনদেশে গিয়েও ছড়িয়ে দিয়েছে। জাপানিদের মতো আমাদেরও এই প্রাণের শহরটাকে ভালোবাসতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে। শহরটিকে প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিতে দিতে হবে। কেননা, এই শহর বাঁচলেই তো আমরা প্রাণের ঢাকাকে পুনরায় ফিরে পাব, যেখানে খেলা করবে মুক্ত বাতাস আর নির্মল প্রকৃতি। আমাদের আজকের এই প্রয়াস হোক আগামীর বাসযোগ্য 'ঢাকা' বিনির্মাণের।

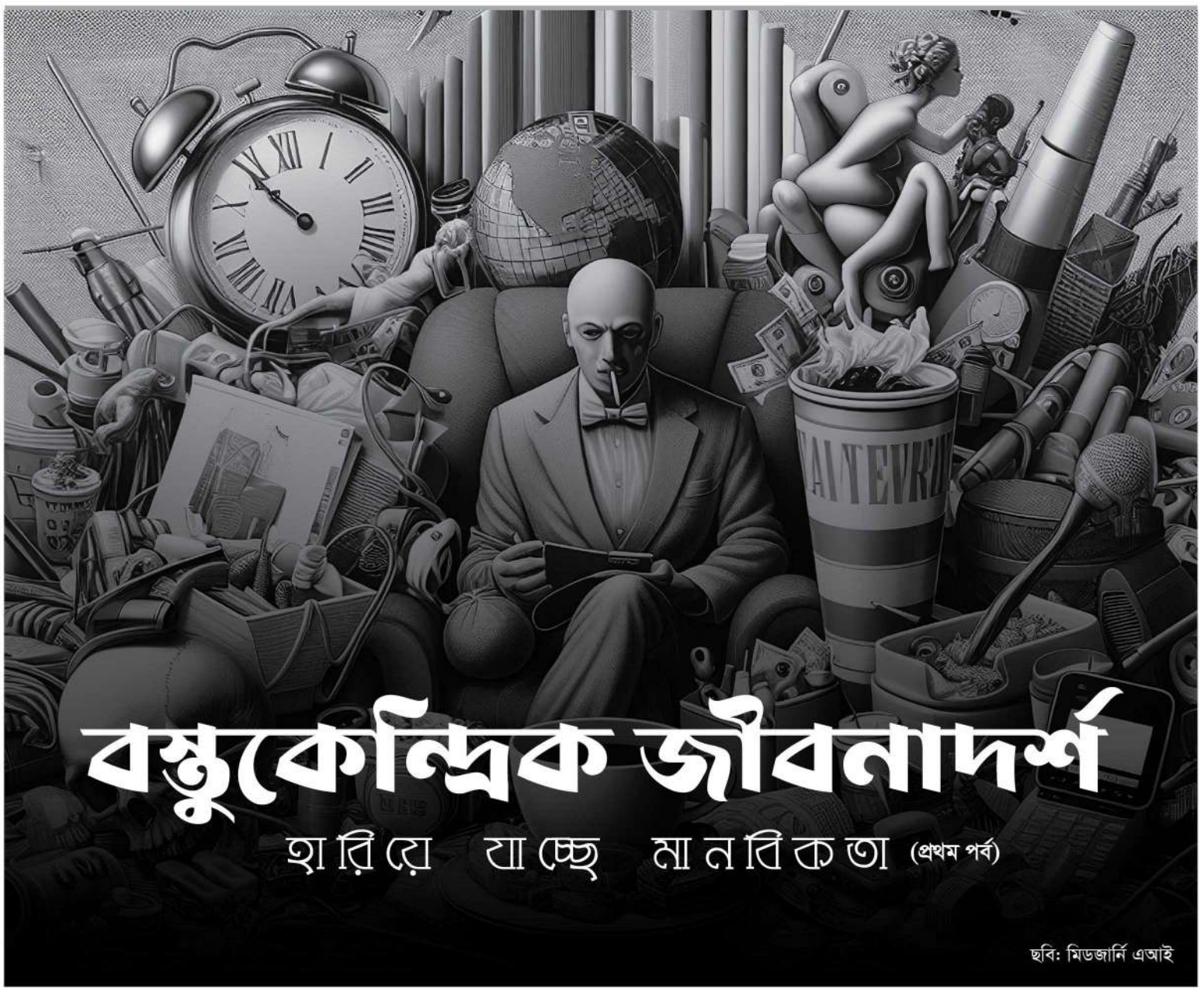

বস্তুকেন্দ্রিক জীবনাদর্শ

হারিয়ে যাচ্ছে মানবিকতা (প্রথম পর্ব)

ছবি: মিডজার্নি এআই

মো. মাসুদ পারভেজ

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির শান্ত হিম শীতল পরিবেশে পরম নিশ্চিন্তে আরাম করে লিখছি আর ভাবছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ইসরায়েলি বিমান বোমা ফেলছে গাজার স্কুলের ছাদে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। বোমার আঘাতে ভেঙে পড়ছে স্কুলের দেয়াল, পুড়ছে লাইব্রেরির শত শত বই আর খোঁড়া হচ্ছে সারি সারি কবর। বোমার তাণ্ডবে গাজার ক্যালেন্ডার থেকে হারিয়ে গেছে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ। বছরের যে সময়টাতে শিক্ষকেরা মহাব্যস্ত থাকতেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের ক্লাস আর পরীক্ষা নিয়ে, ঠিক তাঁরাই এখন ব্যস্ত তাঁদের শিক্ষার্থীদের জন্য কবর খুঁড়তে।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের কাজ ও ব্যবহার এত অমানবিক যে মনে হয়, যেসব গুণ থাকলে মানুষ নিজেকে মানুষ বলতে পারে, তা আজ বিপন্ন। তাদের মানবিক সত্তায় পচন ধরেছে, বিশেষ করে ক্ষমতাবানদের মধ্যে। আর এই পচন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। মানবতার কেতাবি চর্চা হচ্ছে অনেক, কিন্তু চর্যা তার বিন্দুমাত্র নেই। যেখানে মানুষের হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে মানবিক, জ্ঞানের বিকাশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে গড়ে তুলবে নির্মলভাবে, এক প্রজন্ম রেখে যাবে পরের প্রজন্মের জন্য সভ্যতার ছাপ, সেখানে কোথায় যাচ্ছে আজকের মানুষ? তথ্যসর্বস্ব জ্ঞান যত বাড়ছে, মন তত হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক, সৃষ্টি হচ্ছে স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তিত্বের। মানুষের চাহিদার শেষ নেই; যদিও এই চাহিদা তাকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়, কিন্তু অন্তহীন চাহিদা বিবেককে করে কারাবদ্ধ, হারিয়ে যায় মনুষ্যত্ব।

এর ফলে পৃথিবীতে জন্ম নেয় ভোগবাদ, বস্তুকেন্দ্রিক জীবনাদর্শ। বস্তুবাদ মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে মানুষ ভুলেই যাচ্ছে প্রকৃত অর্থে তার প্রয়োজন কতটা। আমরা এখন যে সভ্যতায় বসবাস করছি, তার শুরু হয়েছিল কৃষিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর এই মাটিতে উৎপাদিত সব ফসলে রয়েছে সবার সমান অধিকার। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একদল শক্তিশালী মানুষ খাদ্যশস্যের জায়গায় নীল চাষ করিয়ে ডেকে আনল দুর্ভিক্ষ, অর্ধাহারে-অনাহারে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল কয়েক লাখ মানুষ।

আঠারো শতকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব জন্ম দেয় 'নিউ ইম্পেরিয়ালিজম' নামে আরেক মানবতা গ্রাসকারী মন্ত্র, যা কলোনিয়ালিজমকে উসকে দেয় চরমভাবে। ইংল্যান্ডের বড় সব কারখানার ক্ষুধা মেটানোর জন্য আফ্রিকা আর ভারতে চালানো হলো অমানবিক শোষণ, শুরু করা হলো আধিপত্য বিস্তার। কলোনিগুলোতে অল্প সময়ে কীভাবে আরও বেশি লুটপাট চালানো যায়, তার জন্য বুদ্ধিমান মহল আবিষ্কার করল স্টিম ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনচালিত রেলগাড়ি আর স্টিমার দিয়ে আফ্রিকা আর ভারতের হাজারো গ্রাম উজাড় করে কাঁচামাল আসতে লাগল ইউরোপের বড় বড় কারখানায়। গতি পেল কারখানার চাকা, ফুলে-ফেঁপে উঠল ইউরোপের অর্থনীতি, একসময়ের জীর্ণ বস্তিগুলো রূপ নিল লন্ডন, প্যারিস নামক উন্নত শহরে। এক হাতে ম্যাক্সিম মেশিনগানের ট্রিগার, আর অন্য হাতে দোয়াতের কলম– লিখতে শুরু করল সভ্যতার নতুন ইতিহাস, ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট সাদা মানুষের ইতিহাস। সাদা মানুষেরা নাকি সৃষ্টিকর্তার একান্ত কাছের, তাদের নাকি দায়িত্ব এই আফ্রিকা আর ভারতের অসভ্য কালো মানুষদের সভ্য করার, রুডইয়ার্ড কিপলিং তার 'দ্য হোয়াইটস ম্যান বার্ডেন' কবিতায় তাই তো ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে প্রায় প্রতিটি যুগান্তকারী উদ্ভাবনের পেছনে রয়েছে কোনো না কোনো যুদ্ধের ইতিহাস। জে. রবার্ট ওপেনহাইমারের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা আর সফলতার পরিধি মাপার জন্য প্রাণ দিতে হলো হিরোশিমা আর নাগাসাকির লাখো নির্দোষ মানুষকে। একটা জাতি অন্য জাতিকে কতটা নিখুঁত আর নির্মমভাবে হত্যা করবে, মতের মিল না হলে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে পুরো বিশ্ব, আবিষ্কার করছে ভারী ভারী সব অস্ত্র। যেখানে বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আবিষ্কৃত সব প্রযুক্তি হওয়ার কথা ছিল মানবজাতিকে সুরক্ষাবলয়ে রাখা; সেখানে পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমার কোলবালিশে মাথা রেখে ঘুমাতে যাচ্ছে পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমানেরা, বাঘা বাঘা সব রাষ্ট্রনেতা।

বিশ্বায়ন আর মুক্তবাণিজ্যের এই যুগে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ একে অন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িত। ইউক্রেনে রাশিয়ার মিসাইল কিংবা গাজায় ইসরায়েলের বোমার প্রভাব যে শুধু ওই অঞ্চলের মানুষের ওপরেই পড়ছে, তা কিন্তু নয়; পড়ছে পুরো পৃথিবীর মানুষের ওপর। কেউ হয়তো মারা যাচ্ছে গুলি বা বোমার আঘাতে, আবার কেউ নিষ্পেষিত হচ্ছে মূল্যস্ফীতির জাঁতাকলে। সমাজে দেখা দিচ্ছে বিভাজন, সৃষ্টি হচ্ছে সম্পদ অর্জনের অসম প্রতিযোগিতা; যা জন্ম দিচ্ছে মানুষের মনে হিংসা-বিদ্বেষের। হিংস্রতার ন্যক্কারজনক প্রদর্শন নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে মানুষের আবেগ, আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মানবিকতাবোধ।

বস্তু আর কর্তৃত্ববাদী মনোভাব হয়তো ব্যক্তিপর্যায়ে এনে দিচ্ছে কিছু কৃত্রিম সুখ, জীবন হচ্ছে আরামদায়ক। কিন্তু এই ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয় বিবেক, মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়, আটকে যায় স্বেচ্ছাচারীদের পাতানো ফাঁদে। মানুষ আজ ক্ষমতাবান, স্বেচ্ছাচারী সহ-মানুষের শিকার, নির্দ্বিধায় হত্যায়ও যারা বিচলিত হয় না। তবে কি ডাইনোসরদের মতো একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে মানুষের মানবিকতাবোধ? জালিমের অত্যাচার আর মজলুমের প্রতিশোধের আগুনে পুড়তে থাকবে বিশ্ব?

জীবনজুড়ে শিল্প চাই!

প্রনতি রাহমান

জুলাই মাসের শুরু কেবল। কখনোবা কাঠফাটা রোদ পড়ছে; কখনো শেষ নেই বৃষ্টির। কখনো নিম্নচাপ, কখনো ঘূর্ণাবর্ত, আবার কখনোবা অক্ষরেখার দোহাই দিয়ে বর্ষা উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান। ভালোই লাগে আমার এই আবহাওয়া; মুহূর্তে যেন বদলে ফেলছে প্রকৃতি তার রূপ! অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়লে মন চায়, সারা দিন জানালার পাশে বসে ছবি আঁকি।

ছবি আঁকার প্রতি যে প্রবল আগ্রহ, তা আমার খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল। হাতেখড়ি হওয়ার পর যখন স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখা শুরু, তখন থেকেই আমার মধ্যে ছবি আঁকার এক প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে।

অনেক ইচ্ছা ছিল আর্ট স্কুলে গিয়ে ছবি আঁকা শেখার! ছোট থেকে নিজেই নিজের মতো করে একা একা ছবি এঁকে আসছি!

ঠিক যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ! খোঁজ নিয়ে দেখলাম, আমাদের এলাকাতেই একটি আর্ট স্কুল রয়েছে; 'অংকুর আর্ট একাডেমী'। সব থেকে সুবিধাজনক বিষয় হলো, আর্ট স্কুলটি আমার বাসার খুব কাছে অবস্থিত, উপশহর ক্লাবেই। ফলে আমার আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চাওয়ার বিষয়টি আম্মুকে রাজি করাতে বেশ সুবিধা হলো।

ক্লাস ফোরের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম, সেদিনই আম্মুকে আর্ট স্কুলে ভর্তির বিষয়টা বলব। রেজাল্ট আশানুরূপ হওয়ার কারণে মনোবল কিছুটা বেড়ে গেল।

অপেক্ষার প্রহর যেন শেষই হচ্ছিল না। কখন যে স্কুল ছুটি দেবে, আর আম্মুকে বাসায় গিয়ে আর্ট স্কুলের বিষয়টি বলব!

অতঃপর স্কুল ছুটি হলো! বাসায় গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে আম্মুর কাছে গেলাম। প্রথমে আম্মুকে রেজাল্ট দেখিয়েছিলাম, এরপর মনের মধ্যে অনেকটা ইতিবাচক ভাব নিয়ে আম্মুকে জানালাম আমার আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছার কথা। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আম্মু রাজি হবে না; কারণ, খুব ছোটবেলায় বাবার অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কারণে আমার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্যদিকে মনে হচ্ছিল, যেহেতু আম্মু আমার সকল ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আবদার পূরণে কখনো কোনো ঘাটতি রাখেনি আজ অবধি, সেহেতু এ ক্ষেত্রেও ভিন্ন কিছু না-ও হতে পারে।

আমার এই প্রবল আগ্রহের কথা শোনার পর কিছুক্ষণ আম্মু চুপ করে ছিল। আমি মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর আম্মু বলল, আম্মু রাজি! তিনি আমাকে আগামী শুক্রবার আর্ট স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে যাবেন।

ওই মুহূর্তটি ছিল আমার জীবনের এক অন্য রকম আনন্দের; যেটি আজও স্মরণ করলে আবেগাপ্লুত হয়ে যাই! মনে হচ্ছিল, আমি জীবনের অনেক বড় কিছু পেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর এলো বহু প্রতীক্ষিত শুক্রবার। খুব সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। রাতে ঘুম আসছিল না। কখন যে হবে সকাল।

আম্মুকে সাথে নিয়ে সকাল ১০টায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আর্ট স্কুলে। ভর্তি হলাম সেখানে। সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস ছিল; বৃহস্পতি ও শুক্রবার। আর্ট স্কুলে ভর্তির দিনই ক্লাস করতে শুরু করেছিলাম। যেহেতু ক্লাস ফোরে অধ্যয়নরত ছিলাম, তাই আমাকে ছোটদের গ্রুপে বসিয়ে দিয়েছিল আর্ট শেখার জন্য।

প্রথম দিন হওয়ায় আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। আর্ট স্কুলের শ্রদ্ধেয় পলাশ স্যার আমাকে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি এর আগে অন্য কোনো জায়গায় আর্ট শিখেছি কি না। বললাম, না। এটিই আমার ভর্তি হওয়া প্রথম আর্ট স্কুল। এরপর তিনি বলেছিলেন, আমি কিছু আঁকতে পারি কি না; পারলে তাকে কিছু একটা এঁকে দেখাতে। আমি তাঁকে একটি ছবি এঁকে দেখিয়েছিলাম। আমার আঁকা ছবি দেখে তিনি বেশ খুশি হয়েছিলেন।

সেদিন আর্ট স্কুলে ছুটি শেষে, আম্মু আমাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এলে পলাশ স্যার আম্মুকে বলেছিলেন, আমার ছবি আঁকার হাত বেশ ভালো। চেষ্টা করলে আমি আর্ট নিয়ে অনেক দূর এগোতে পারব। কথাটি আমাকে যে এত বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল যে তা বলে বোঝাতে পারব না।

এভাবে বেশ মজায় মজায় চলতে থাকে আমার ছবি আঁকার পথ। ধীরে ধীরে জলরঙের কৌশল বেশ ভালোভাবে আয়ত্তে নিয়ে এসেছিলাম।

আর্ট স্কুলের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন, স্কুলের একজন ম্যাডাম, 'মিরা আপু'। তিনি আমার ম্যাডাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আপু বলেই সম্বোধন করতাম। তিনিও আমাকে অনেক বেশি আদর করতেন। মনে হতো যে আমি যেন তাঁর আপন ছোট বোন।

ক্লাস ফাইভে যখন পড়ি, তখন প্রথম ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের যশোরে, উপশহরেই অবস্থিত এস এম সুলতান আর্ট কলেজ; সেখানেই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রথমে আমি কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করতে চাইনি। কারণ, মনের মধ্যে লজ্জা ও ভয় কাজ করছিল– যদি প্রতিযোগিতায় কোনো স্থান অধিকার করতে না পারি!

তবে মিরা আপু আমাকে জোর করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি কোনো স্থান অধিকার করতে না-ও পারি, মন খারাপের কিচ্ছু নেই।

তিনি আমাকে প্রতিযোগিতার স্থান অধিকারের উপহারের সমতুল্য উপহার দেবেন, যদি আমি কোনো স্থান অধিকার করতে না-ও পারি।

অবশেষে মিরা আপুর আগ্রহ ও ইচ্ছাতেই আমি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম এবং অংশগ্রহণ করা প্রথম প্রতিযোগিতায় আমি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম।

ছবি: লিওনার্দো এআই

আত্মকথন

এরপর থেকে আমি আর থেমে থাকিনি। শহরের মধ্যে যখন যেখানেই ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো, সেখানে আমি অংশ নিতাম।

যখন ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় স্থান অধিকার করে, বিভিন্ন পুরস্কার ও সার্টিফিকেট নিয়ে এসে আম্মুর হাতে তুলে দিতাম, তখন আম্মুর মুখের হাসিটা দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠত। সব থেকে বেশি আনন্দিত হতাম আম্মুর মধ্যে আমার জন্য গর্বিত অনুভূতির ভাবটি দেখে। মনে হতো যেন আমার হাতে ঈদের চাঁদ পেয়ে গেছি!

এভাবেই চলতে থাকে আমার ছবি আঁকার যাত্রা। ভালো লাগা কাজ সব সময় যেমন মনে আনন্দ দেয়, তেমনি আমার জীবনের সব থেকে ভালো লাগার কাজ হলো ছবি আঁকা। যার জন্য আমার জীবনের সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার পেয়েছি এবং উপভোগ করতে পেরেছি।

অষ্টম শ্রেণিতে উঠলাম। চাপ বাড়ল পড়াশোনার। কারণ, বছর শেষে জেএসসি পরীক্ষা। বন্ধ হয়ে গেল আমার আর্ট স্কুলে যাওয়া। তবু বন্ধ রাখিনি ছবি আঁকা। পড়াশোনার ফাঁকে যখনই সুযোগ পেতাম, ছবি আঁকতাম।

শেষ হলো জেএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আবার শুরু হবে আমার আর্ট স্কুলে যাওয়া। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, ক্লাস নাইনে পরিবারের চাপে আমাকে বিজ্ঞান বিভাগ নিতে হলো। বেড়ে গেল আরও অনেক বেশি পড়াশোনার চাপ। আমার ইচ্ছা ছিল, মানবিক বিভাগে পড়াশোনা করব, এরপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চারুকলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমার পরিবারকে এ বিষয়ে রাজি করাতে পারিনি। তাদের ইচ্ছা, মেয়ে অনেক বড় ডাক্তার হবে। কিন্তু আমার মন ও প্রাণজুড়ে রয়েছে যে শুধুই শিল্প! শুধুই ছবি আঁকা। এবার আমার ছবি আঁকা অনেকটা কমে গেল। বাসা থেকেও আমাকে বলা হয়েছিল ছবি আঁকা কমিয়ে দিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে। ছবি না আঁকতে পারার জন্য মাঝে মাঝেই সে সময় আমি বিষণ্ণতায় ভুগতাম।

এরপর এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট পেলাম। এবারও ফল জিপিএ-৫। আপ্রাণ চেষ্টা ও ত্যাগের ফল আমি পেয়েছি। এরপর ভেবেছিলাম, পরিবারকে এবার রাজি করাতে পারব আমার বিভাগ পরিবর্তন করার জন্য। কিন্তু এবারও আমি ব্যর্থ। ছবি আঁকা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পড়ে গিয়েছিলাম চরম বিষণ্ণতায়। এবার পড়াশোনা থেকেও একেবারে মন উঠে গিয়েছিল। কোনোভাবেই পড়াশোনায় মন দিতে পারছিলাম না। ফলস্বরূপ এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অকৃতকার্য হলাম। সে সময় কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছিলাম। বিষণ্ণতা আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিল। আমার এই চরম বিষণ্ণতা ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে আম্মু বলেছিল, কোনোভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার আমাকে আমার মনমতো বিষয়ের ওপরে পড়াশোনা করতে দেবে। কথাটি শুনে যেন আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছিলাম। ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম এইচএসসি পরীক্ষায়। কারণ, এবার আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য এগিয়ে যেতে পারব। 'আমার স্বপ্ন চারুকলা'। হ্যাঁ! চারুকলায় অধ্যয়ন করতে পারাটাই ছিল আমার জীবনের সব থেকে বড় স্বপ্ন। কিন্তু চলে এলো প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। ঘোষণা এলো, হবে না আমাদের পরীক্ষা। সারা দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

এ সময় যশোর থেকে ঢাকায় এলাম। চারদিকে কেমন যেন এক শোকের ছায়া। সবকিছু বন্ধ। শোনা যায় মৃত্যুর সংবাদ। দিন দিন ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। ভাবলাম আমাকে এভাবে ঘরে বসে থাকলে হবে না। তাই ঘরে থাকা কাগজ ও পেনসিল নিয়ে শুরু করে দিয়েছিলাম ছবি আঁকা। সেখান থেকে আবার শুরু হলো আমার ছবি আঁকার যাত্রা।

সেবার ঈদুল ফিতরে আমার ঈদের নতুন জামাকাপড় কেনার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম রঙ, তুলি ও ক্যানভাস। ছিল হতাশার ছাপ, তবু দ্বিতীয়বারের মতো প্রবল আগ্রহ আর মনোবল নিয়ে শুরু করলাম ছবি আঁকা। সারাটা দিন অনলাইন ও ইউটিউব ঘেঁটে বিভিন্ন আর্টের টিউটোরিয়াল দেখতাম। অনেক বছর ছবি আঁকা ছাড়াই সময় কেটে গিয়েছিল। তাই মনের মধ্যে একটি জিনিসই ঘুরত যে, এবার আগের থেকেও অনেক ভালো করে ছবি আঁকা আয়ত্ত করতে হবে।

অনেক ইচ্ছা ছিল ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক রঙ দিয়ে ছবি আঁকার, কিন্তু আর্ট স্কুল থেকে তা শিখতে পারিনি। তবে অনলাইন ঘেঁটে ও ইউটিউব থেকে আমি ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক পেইন্টিং আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম। এর পাশাপাশি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় ভর্তি পরীক্ষার জন্য। ধীরে ধীরে দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করল।

আশার আলো দেখতে পেলাম। সারা দিন ছবি আঁকতাম। সে যেন এক না পাওয়াকে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়া! সারা জীবন শুধু ছবিই আঁকতে চাই! রঙতুলির আঁচড়ে আমার মনের মধ্যে ভেসে থাকা প্রতিচ্ছবিগুলো ক্যানভাসে তুলে ধরার মধ্যে যে আনন্দ, তা যেন আর কোনো কিছুতেই নেই! 'সাদা মেঘের মতো ক্যানভাসে, আঁকছি জীবন চারপাশে!'

চারুকলার ভর্তি পরীক্ষার ঠিক এক মাস বাকি, তখন যশোরে গিয়েছিলাম তিন দিনের জন্য। কিন্তু ভাগ্য তখন আমার সাথে কঠিন এক আচরণ করল। আম্মু সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। আটকে গেলাম সেখানে দেড় মাসের জন্য। স্বপ্নপূরণের এত কাছাকাছি এসেও

> বাকি অংশ **পৃষ্ঠা ৫, কলাম ৩**

পয়েন্ট থ্রি শিঙাড়া

> **পৃষ্ঠা ২** এর পর

সফল উদ্যোক্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা উদ্যোগের নাম দেন 'পয়েন্ট থ্রি শিঙাড়া'। নাম দেখেই আঁচ করা যায় এই তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগের ধরন। তাঁরা ক্যাম্পাসে শিঙাড়া ও চপ বিক্রি করেই মাসে আয় করছেন প্রায় ৩ লাখ টাকা। এতে তাঁরা শুধু নিজেদের স্বাবলম্বী করেননি, বরং একটি সামাজিক বার্তা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। এমন উদ্যোগ ছাত্রজীবনে শুধু আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে না, বরং সামাজিক দায়িত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে। ছাত্রজীবনে এই ধরনের উদ্যোগ নিতে গেলে ব্যক্তিগত সাহসিকতা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন হয়; যা পরবর্তী জীবনে অনেক বড় সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে।

সফল এই উদ্যোক্তারা হলেন আল ইমরান, আশিকুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, রিয়ান আহমেদ, নাসিব নেওয়াজ, সজীব আহমেদ, মাহামুদুল হাসান, শিপন ইসলাম ও সাগর চন্দ্র দাস। উদ্যোগের ভাবনাটা আসে মূলত ক্যাম্পাসের একটি টং দোকানে আড্ডা দিতে গিয়ে। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ইমরান ও আশিকুল বলেন, 'ক্যাম্পাসে আমরা টং দোকানে বসে মাঝেমধ্যে আড্ডা দিই। একজন-দুজন করে সহপাঠীদের বেশ একটা জটলা হয়ে যায় খুব কম সময়ে এবং আড্ডা চলে অনেকক্ষণ ধরে। একসময় আমাদের মাথায় এলো, এই রকম একটা টং দোকান দিলে কেমন হয়? ফলে আমরা নানা রকম স্ট্রিট ফুডের কথা চিন্তা করলেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিই, শিঙাড়া বিক্রি করব। কারণ, কম দামের কিছু হলে সবাই খুব সহজে আমাদের কাছ থেকে কিনে খাবে।' এই ভাবনা থেকে তাঁরা নিজেদের জমানো ৪০ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করেন কাজ। পরে ধীরে ধীরে টিমের অন্য সদস্যরা যুক্ত হন। তাঁরা টং দোকানের নাম দেন 'পয়েন্ট থ্রি শিঙাড়া'। এমন নামের কারণ জানতে চাইলে ইমরান বলেন, 'আমাদের শিঙাড়ার দাম মাত্র ৩ টাকা। এ কারণে আমরা এমন নাম ঠিক করি। সঙ্গে যুক্ত করি পয়েন্ট, যাতে খুব সহজে সবাই বুঝতে পারেন, আড্ডাটা কোন জায়গায় এবং কী খেতে খেতে।'

তাঁরা শিঙাড়ার পাশাপাশি বিক্রি করছেন ৫ টাকায় চপ। এতে করে তাঁদের দোকানে ভিড় করে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীসহ ঘুরতে আসা অনেকে। এই শিঙাড়া আকারে ছোট হলেও সবার আকর্ষণের কারণ হলো পরিবেশনের বিষয়টি। তাঁরা ছোট বাটিতে করে সরিষা, টমেটো ও তেঁতুল– এই তিন পদের টক দিয়ে থাকেন। এবং আকর্ষণের আরও একটি বিশেষ কারণ হলো কাঁচা নাগা মরিচের স্বাদ। এসব কারণে টোকেন কেটে অপেক্ষা করতে হয় পয়েন্ট থ্রি শিঙাড়ায় খেতে আসা সবাইকে। ক্যাম্পাসে বা রাজশাহীর আর কোথাও এই শিঙাড়া পাওয়া যায় না। সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত ভিড় লেগে থাকে তিন পদের টক এবং নাগা মরিচের স্বাদ নিতে আসা মানুষদের। এভাবে তাঁরা দৈনিক কমবেশি ৮ থেকে ৯ হাজার টাকার শিঙাড়া ও চপ বিক্রি করেন। উদ্যোক্তাদের সবাই শিঙাড়া ও চপের মান নিয়ে বেশ সতর্ক। তাঁরা বরিশাল থেকে সংগ্রহ করেন নাগা মরিচ– শুধু ঝাল ও ঘ্রাণের মান ঠিক রাখার জন্য। এখন যেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, এভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে সামনের দিনে তাঁরা আরও আইটেম বাড়াতে চান এবং পয়েন্ট থ্রি শিঙাড়ার শাখা বাড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই ধরনের উদ্যোগ শুধু নিজেদের ভবিষ্যতের পথকে সুগম করে না; বরং এসব উদ্যোক্তা সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য অবদান রাখেন। তাঁরা অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি সামাজিক উদ্ভাবনের পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি অন্যান্য তরুণ ছাত্রের মধ্যেও আত্মনির্ভরতা এবং উদ্যম তৈরি করে, যা পরবর্তী সময়ে তাঁদের ক্যারিয়ার গড়ার পথে সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই ছাত্রদের এমন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, প্রচেষ্টাকে স্বীকার করা এবং তাঁদের সাফল্যে আনন্দিত হওয়া উচিত। এতে করে তরুণেরা নিজেদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে বুঝতে পারবেন। আগামী দিনে সুন্দর ও সাফল্যের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাইলে তরুণদের এসব উদ্যোগকে আরও বেশি সাধুবাদ জানাতে হবে।

ছবি ও তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, জাগো নিউজ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ

শৈশবের স্মৃতিকথা

হাসনাহেনা আক্তার কনা ও রাজ শেখ

শৈশব স্মৃতির কথা সবার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। দিন আসে, দিন যায়। মানুষের জীবন স্মৃতির অ্যালবামে আবদ্ধ হতে থাকে। কিছু স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়, আর কিছু স্মৃতি যেন কখনো ভোলা যায় না। মাঝে মাঝে জীবনের অতীত পানে যখন ফিরে তাকাই, তখন ফেলে আসা বর্ণাঢ্য সুখস্মৃতি মানস চোখে মায়াবী রূপে ধরা দেয়। দিনগুলো ছিল বড় সুন্দর, বড্ড রঙিন আর খুব মধুময়। জীবন থেকে চলে যাওয়া শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো আজও ভুলতে চাইলেও ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। এই দিনগুলোর কথা মনে আসতেই কেমন যেন পুলকিত হয়ে ওঠে! কত রঙিন ঘটনা, কত উচ্ছ্বাস, কতই-না উল্লাস মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সবই এখনো রয়েছে স্মৃতির ফ্রেমে বন্দি।

শৈশব স্মৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা চরিত্র হলো বাবা। যিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধুসুলভ আচরণ করে থাকেন, ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেন। তিনি আমাদের শৈশব আলোকিত করেন, সুন্দর করে সাজিয়ে দেন, দুঃখ-কষ্ট নিমেষেই ভুলে যেতে সহযোগিতা করেন। আর যাঁর আঁচলের তলে রেখে আমাদের ধীরে ধীরে বড় করে তোলেন, যাঁর সাথে আর কারও তুলনা করা যায় না, তিনি হলেন মা; আর সেই মায়ের কথাই এখন বলছি, যিনি সবার শৈশব স্মৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মা নামে এই মানুষটিকে কেউই কখনো ভুলতে পারে না। তার সঙ্গে থাকার সকল স্মৃতি অন্য স্মৃতিগুলো থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে। শৈশবের স্মৃতি অসংখ্য হয়ে থাকে, ভাই-বোনের স্মৃতি, বন্ধুবান্ধবের স্মৃতি, লেখাপড়ার স্মৃতি, বৃষ্টির দিনের স্মৃতি, পাড়া-মহল্লা ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি, স্কুল পালানোর স্মৃতি, মামার বাড়ির স্মৃতি, এমন হাজারো শৈশবের স্মৃতি আমাদের এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়।

বর্তমানে মিরপুর মডেল থানায় কর্মরত আছেন পুলিশ অফিসার জনাব রাসেল মাহমুদ। তিনি বলেন, শৈশব জীবন তাঁকে এখনো পিছু টানে। তবে শৈশব কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ, বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। তিনি প্রকাশ করেন, শৈশব তাঁর সব থেকে মধুময় একটি স্মৃতি। তিনি বলেন, ছোটবেলায় স্কুলে যেতে যতটা না ভালো লাগত, তার থেকে বেশি ভালো লাগত, যখন স্কুল পালাতাম। স্কুলজীবনে কতশতবার যে স্কুল পালিয়েছি, সেটা হিসাব করা যায় না। স্কুলে যেতে না চাইলে বাবা অনেক রাগারাগি করতেন, মা হাজারো বকুনি দিতেন। মাঝে মাঝে বাবার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্কুলে যেতাম না। কিন্তু মা বাবাকে সামাল দিতেন। মাথাব্যথা, পেটব্যথা, পায়ের ব্যথা– এসব অজুহাত দেখিয়ে স্কুলে যেতাম না। বেশির ভাগ সময় এমন হয়েছে, ঠিকই বই-খাতা নিয়ে বের হয়েছি; কিন্তু স্কুলে যাইনি। বই-খাতা কোথাও লুকিয়ে রেখে বন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম ও খেলাধুলা করতাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে বাড়িতে ফিরে যেতাম। স্কুলের শিক্ষকেরা প্রায়ই বাড়িতে অভিযোগ জানাতেন। আর ঠিক তখনই সবার বকুনি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত।

স্বপন কুন্ডু নামের এক দোকানি বলেন, শৈশবকালে আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল বছরের উৎসবের দিনগুলো। সেই উৎসবের দিনগুলোকে উপলক্ষ করে গ্রামে গ্রামে পাওয়া যেত নতুন নতুন জামা-প্যান্ট। মা-বাবার সঙ্গে হই-হই করে কিনতে যেতাম। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে ছেলেবেলায় কাটানো দুর্গাপূজার কথা খুব বেশি মনে পড়ে। প্রতিবছর দুর্গাপূজার দিনে আমরা সপরিবারে গ্রামের বাড়ি চলে যেতাম। সেখানে বাড়ির সব ভাইবোনসহ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একত্র হয়ে পূজা কাটানোর আনন্দ, তা কখনো ভোলার নয়। পূজার দিনগুলো আমাদের কাটাতে হতো বাড়ির মণ্ডপে, ঠাকুরের কাজ করে, আর হয়তো মাঠে কিংবা নদীর ধারে হইহুল্লোড় করে। এ ছাড়া স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে শৈশবের নববর্ষের দিনগুলোর কথা। প্রতিবছর নববর্ষের দিনে নতুন জামাকাপড় পরে মা-বাবার সঙ্গে হাত ধরে আমরা পরিচিত বিভিন্ন দোকানের হালখাতা করতে যেতাম। যেহেতু আমি ছোট ছিলাম, মা-বাবা আমাকে নিয়েই যেতেন সঙ্গে করে। অপরদিকে আমার বড় ভাই, ছোট বোনকে বাড়িতেই রেখে যেতেন। সকল দোকানদার কাকু আমায় ভালোবেসে নিজের হাতে মিষ্টি খাইয়ে দিতেন। সেই হুল্লোড় আর নিখাদ আনন্দের দিনগুলো আজ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

রিকশাচালক মনির মিয়া বলেন, আমি কৃষিজীবী বাবার সন্তান। আমার পরিবারে পাঁচ ভাই, তিনজন বোনসহ সদস্য সংখ্যা ছিল দশজন। অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি। তবে আমি মনে করি, শৈশব জীবন সুখের মধ্য দিয়ে কাটুক অথবা দুঃখের মধ্য দিয়েই কাটুক না কেন, শৈশব জীবনের মতো মধুময় সময় আমার জীবনে আর কখনো আসেনি। আমি এখন রিকশা চালাই। ভালো একটা অর্থ উপার্জন করি। আমার পরিবার তিন বেলা ডাল-ভাত খেতে পারে। কিন্তু সে সময় আমার বাবার দ্বারা এটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

তারপরও মনে হয়, আমার যেন ওই সময়টাই ভালো ছিল। বাবার সাথে জমিতে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় আমি বাবা এবং আমার বাকি ভাইয়েরা একসঙ্গে মাছ ধরতাম। মাছের পরিমাণ বেশি হলে মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে বিক্রিও করে আসতাম। নিজের হাতে মাছ ধরা এবং মায়ের হাতের রান্না ছিল অনেক স্বাদের। কোথায় যে হারিয়ে গেল সেই দিনগুলো। আমি একবার না, বারবার ফিরে যেতে চাই আমার শৈশবে।

পৃথিবী বহুমুখী হতে পারে, মানুষের জীবন বর্ণময় হতে পারে, হতে পারে চিন্তাশীল এবং সৃজনশীলতার প্রতীক। কিন্তু একজন মানুষের কাছে তার শৈশবের থেকে প্রিয় পৃথিবীর অন্য কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই শৈশব থাকে। এই সত্যের ব্যতিক্রম কেউ নয়। কারও শৈশব থাকে পরম সুখের, আবার কারও শৈশব কাটে পাহাড় সমান কষ্টে। কিন্তু স্মৃতিচারণায় যখন আমরা বসে পড়ি, তখনই সুখ-দুঃখ ছাপিয়ে শৈশব হয়ে ওঠে সাগর সমান আনন্দের। শৈশবের সেই অনাবিল সারল্যকে নিখাদ স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্তরে বাঁচিয়ে রাখাই হয়তো জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

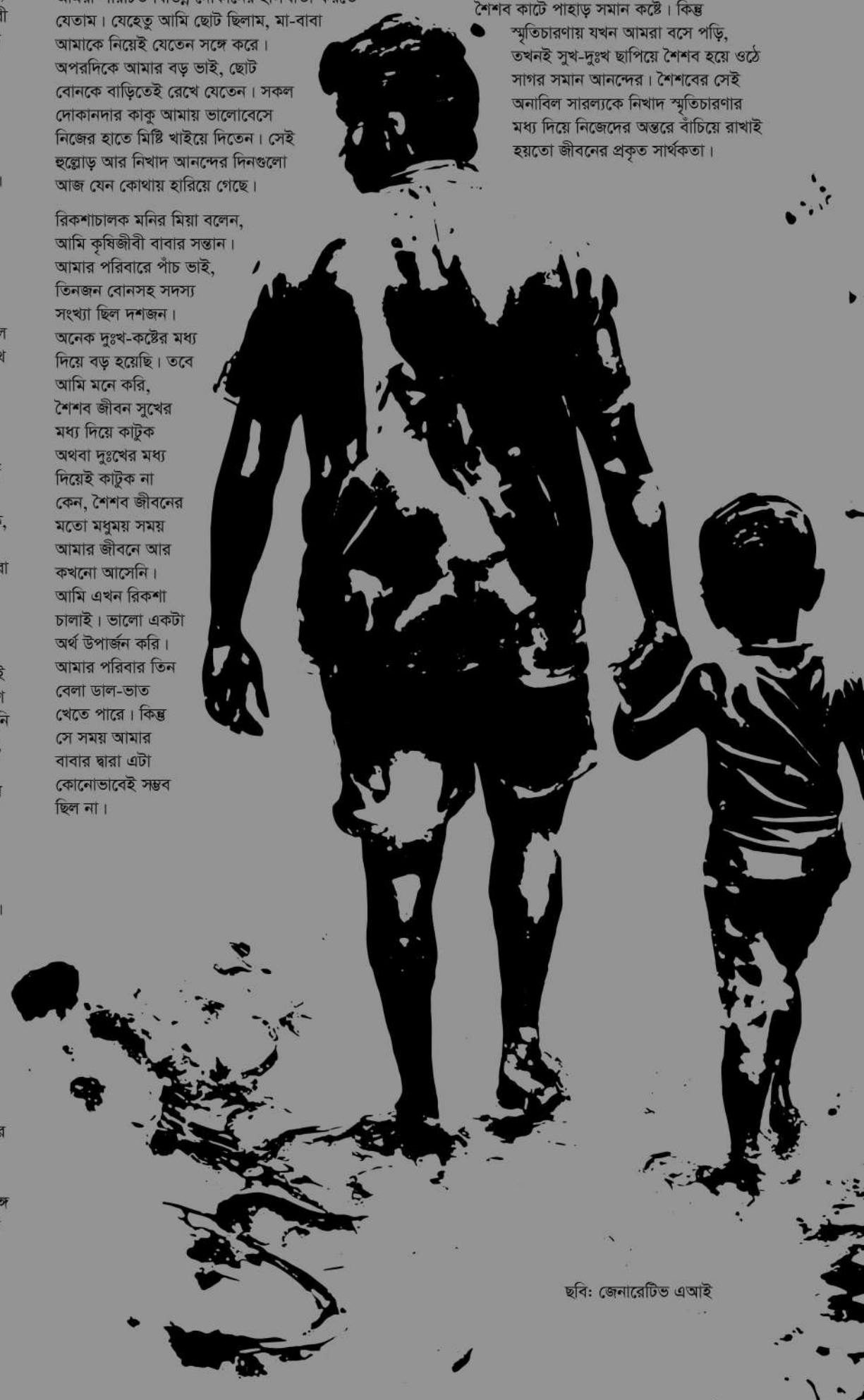

ছবি: জেনারেটিভ এআই

দাদি-নানিরা বরাবরই অপরিবর্তনীয়

নাহিয়ান জামাল জয়িতা

এক মিষ্টি গন্ধের ঢেউ সেদিন যেন আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। আমার পা যেন সেখানেই জমে গেল; বুকে হোঁচট খেলাম। বসার ঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে ভাবছিলাম, এ স্বপ্ন নয় তো? আমি উন্মত্তভাবে সেই মুখগুলো খুঁজছিলাম, যাদের দেখার জন্য মন আকুল হতে লাগল, কিন্তু এ যাত্রা বৃথা হলো। আমার এই আকস্মিক স্মৃতিবেদনার উৎস ছিল তাকের ওপর নারকেল তেলের চিরচেনা সেই নীল কৌটা।

আমি আমার দাদুকে (দাদি) হারিয়েছি প্রায় ৭ বছর আগে, এবং আমার নানুমণিকে (নানি) ২ বছর আগে। আমি তাঁদের শেষ মুহূর্তে কারও সঙ্গে থাকতে পারিনি; এই অপরাধবোধ আমায় নিদ্রার ছলে বিভিন্ন অলীক কল্পনা এবং প্রাণবন্ত হ্যালুসিনেশনের দিকে নিয়ে যায়। তাঁরা যেন আমায় সান্ত্বনা দিতে আসেন। বলেন, তাঁরা আমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমার দুঃখ বেড়েই চলে যখন পুরোপুরি উপলব্ধি হয় যে তারা আর ফিরবেন না। নিজের ভেতর কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করি– বুঝতে পারি, আমার জীবনে তাঁদের স্থানগুলো অপূরণীয়। দাদি-নানিরা সর্বজনীনভাবে কর্তৃত্ব ও করুণার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত; অবচেতনভাবে, তারা প্রায়ই প্রথম নারী যাদের আমরা আমাদের আদর্শ মানি। দাদু ও নানুমণি ছিলেন আমার নিরাপত্তার জাল। আমাদের সম্পর্ক ছিল পরম বন্ধুত্বের, নিঃস্বার্থ আর শর্তহীন ভালোবাসার।

তাঁদের আঁচল আমায় রক্ষা করত সর্বদা। সে কোনো দুষ্টু ভাইবোন হোক, আমার মা-বাবার বকা, আর দুঃস্বপ্নই হোক না কেন। তাঁরা পরিবারের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আমার সকল ইচ্ছা এবং অবাঞ্ছিত চাহিদা পূরণে কোনো দিন পিছু হটেননি। এমনকি পরিবারের কেউ আমাকে নিয়ে পরিহাস করলে তাঁরাই সবার আগে অন্যদের শাসাতেন; আমার একটু হাঁচি বা কাশি হলেই যেন তাঁদের চিন্তার শেষ ছিল না! আমিও তাঁদের জন্য নির্দ্বিধায় যেকোনো লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলাম– আমার বয়স যা-ই হোক।

তাঁদের লালন-পালনের ধরন এবং জীবনদর্শন ছিল বিপরীত মেরুর; দাদু ছিলেন নীতিবোধ এবং চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে নানুমণির কাছে প্রাধান্য পেত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আবেগপ্রবণ মূল্যবোধ। দুই পরিবারের বড় নাতনি হওয়ার সুবাদে আমি দুই জগৎই সমানভাবে উপভোগ করেছি। বলতে গেলে তাঁরা আমার মা-বাবার মা, কিন্তু আমার জন্য ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। দাদুর জন্য তাঁর চাঁদ আর নানুমণির ছায়া হতে পেরেছিলাম। একই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক; একই সঙ্গে ভক্ত। আমি অন্যদের সঙ্গে যতই তর্ক করি না কেন, তাঁদের নির্দেশ নিয়ে না কোনো দিন প্রশ্ন তুলেছি, না তাঁদের আদেশ অমান্য করেছি; তাঁদের হতাশ করাটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমার একটাই আফসোস যে, বছরের পর বছর দাদি-নানির কাছে এত কিছু শেখার পরও তাঁদের হাতের সুস্বাদু সব খাবার কখনো বানাতে শিখিনি; সেগুলো অন্য কেউ বানাতে পারবে বলেও মনে হয় না। বিশেষ কোনো উপলক্ষ, বিশেষ করে ঈদের দিনে, আমার মন সেই পরিচিত স্বাদগুলো খুঁজে বেড়ায়। মন চাইত দাদুর হাতের পোলাও, সঙ্গে মুরগির ঝাল তরকারি এবং নানুমণির করা জর্দা সেমাই ও পিঠা খেতে; অন্তত ঈদের দিনটায় এই খাবারগুলো না খেলে আমার কেন যেন চলতই না! যদিও মা সেই খাবারগুলো যথাসম্ভব সুস্বাদুভাবে তৈরির চেষ্টা করেন, কিন্তু কেন যেন মনে হতো, দাদু বা নানুর হাতের সেই স্বাদ পাওয়া যায় না!

আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় চা খাওয়ার অভ্যাসটা তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া। দাদু সন্ধ্যার নামাজের পরে চা খেতে পছন্দ করতেন; নানুমণি আবার সূর্যাস্তের ঠিক আগে, আসর এবং মাগরিবের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে চা বানাতেন। তাঁদের চা খাওয়ার সময়, নাশতা, এমনকি চায়ের স্বাদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য ছিল। আমি চায়ে কতটুকু দুধ বা চিনি মেশাতাম, তা আমি কি দাদুর বাসায়, নাকি নানুর বাসায় আছি, তার ওপর নির্ভর করত!

তাঁরা আমার বেশির ভাগ শখ পূরণের চেষ্টা করেছেন। ব্যবহারিক জ্ঞান কিংবা ইতিহাসের প্রতি আমার ঝোঁক থেকে শুরু করে রূপকথার গল্প এবং পৌরাণিক কাহিনির প্রতি আমার মুগ্ধতা– এই সবকিছুর অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁরা। যদিও দাদু সংস্কৃতি-অনুরাগী ছিলেন না, তিনি আমার সব অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে বসতেন, আর নানুমণি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য মঞ্চের পেছনে আমার সঙ্গে থাকতেন। আজকাল আমি সেই শূন্যতা পূরণ করতে মঞ্চে ওঠার সময় তাঁদের কোনো না কোনো জিনিস সঙ্গে রাখি।

আমি তাঁদের উপস্থিতি প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করি কখনো সদ্য মাড় দেওয়া শাড়ির নির্যাসে, কিংবা তাঁদের বালাগুলো আমার হাতে জড়িয়ে– যেন তাঁরা আমায় আগলে রেখেছেন। পান-সুপারির সুগন্ধ বা আমের আচারের বয়ামে লেপ্টে আছে আমাদের ফেলে আসা বিকেলের ঘুম, উষ্ণতম আলিঙ্গন এবং হৃদয় উন্মুক্ত করা অজস্র অট্টহাসি। আমার চোখগুলো নিজের অজান্তেই সিক্ত হয়, যখনই আমি কাউকে তাদের দাদি-নানির কথা বলতে শুনি। সেই মুহূর্তে খুব মনে পড়ে, আমারও যদি হ্যারি পটারের প্রফেসর ডাম্বলডোরের মতো সেই জাদুর পেনসিভ (স্মৃতিযন্ত্র) থাকত, যাতে পুরোনো স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া যায়, আমি আরও একবার তাঁদের ভালোবাসার চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে নিতে পারতাম!

ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্পনায় গড়া তেলরঙের চিত্রকর্মে দাদির সঙ্গে গল্পে মুখর ছোট্ট শিশু

নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ও সেন্ট মার্টিনে ঈদ উদ্‌যাপন

মো. নওশাদ আলম

আমি একজন ভ্রমণপিয়াসি মানুষ। একটা নতুন স্থানে যাওয়া, সে জায়গার সংস্কৃতি, খাওয়া-দাওয়া এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যাওয়া রীতিমতো নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈদের ছুটি এবার বেশ বড়। মনে একটা বাসনা হলো যে এবার ঈদ একদম নতুন কোনো জায়গায় করলে কেমন হয়? কিন্তু কোথায়, কোন প্রান্তে ঈদ করা যেতে পারে, সেই স্থান নিয়ে দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু আমি ঘুরতে বেশ পছন্দ করি, তাই আমাকে পাহাড়, সমুদ্র বা নতুন কোনো স্থান– সবকিছুই আমাকে টানে।

২ এপ্রিল ২০২২। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ করে ক্যাম্পাসের একটা গোলচত্বরে ভাবনায় ডুবে ছিলাম। ভাবছিলাম এবারের ঈদুল ফিতরের ছুটিটা কীভাবে কাজে লাগানো যায়। মাথায় একবার দেশের বাইরের ডেস্টিনেশন ঘুরছিল যেমন দার্জিলিং, সিকিম। আবার দেশের কোনো এক অজপাড়ায় ঈদ করার ভাবনাও তৈরি হচ্ছিল।

তবে এবারের জায়গা পছন্দ করার ক্ষেত্রে আমি বেশ কিছু বিষয় প্রাধান্য দিই। যেমন পাহাড়ে যদি ঈদ করতে যাই, তবে সেটা অর্থপূর্ণ না-ও হতে পারে, কেননা পাহাড়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ঈদ উৎসব নেই। আমার এমন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, যেখানে ঈদ উদ্‌যাপন করা হয়।

অনেক হিসাব-নিকাশ করার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, সেন্ট মার্টিনেই যাব। সোলো ট্রিপ হিসেবে এবং ঈদের জন্য সেন্ট মার্টিন উপযুক্ত মনে হয়েছে। আর তখনকার সময়টা ছিল সেন্ট মার্টিন যাওয়ার জন্য অফ সিজন। কারণ, গ্রীষ্মকালে কোনো ট্যুরিস্ট তেমন সেখানে যায় না; যা আমার সোলো ট্রিপকে বেশ আনন্দময় করে তুলবে।

৮ এপ্রিল আমার ঈদের আগে শেষ ক্লাস ছিল। তারপরের দিনই আমি রওনা হলাম টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে। প্রথমে আমি টেকনাফের বাস ধরে যাত্রা শুরু করি। যখন সময় গড়াল, সকাল হলো, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের হাইওয়ে রাস্তাটা সকালের মিষ্টি রোদে খুব সুন্দর লাগছিল। সকালের শান্ত আবহাওয়া, কোমল বাতাস মনকে আরও তাজা করে দিয়েছিল।

এরপর কক্সবাজার থেকে টেকনাফের রাস্তা যখন শুরু হলো, তখনকার দৃশ্যটা ছিল অপরূপ। রাস্তাটা ছিল অনেকটা পাহাড়ি রাস্তার মতো। টেকনাফ শহরে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে থেকেই রাস্তার এক পাশে ছিল নাফ নদী, অন্য পাশে ছিল সারি সারি পাহাড়। মনে হচ্ছিল যেন এই নদী আর পাহাড় আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

টেকনাফে পৌঁছে আমি সেখানকার স্থানীয়দের সহযোগিতায় সেন্ট মার্টিনে যাওয়ার ট্রলারের খোঁজ করলাম। তাদের তথ্যমতে ট্রলার ছাড়বে সকাল ৯টায় আর তখন ঘড়িতে ৭টা। যেহেতু আমার কাছে আরও ২ ঘণ্টা সময় ছিল, তাই ভাবলাম এই সুযোগে টেকনাফ ও তার আশপাশের এলাকায় একটু ঘুরে দেখা যাক। সেখানকার আঞ্চলিক মানুষের কাছ থেকে জানতে পারলাম, এটুকু সময়ের মধ্যে শাহপরীর দ্বীপ অথবা জেটি ঘাট ঘুরে আসতে পারি। সিদ্ধান্ত নিই, জেটি ঘাটের দিকে ঘুরতে যাব।

জেটি ঘাটে ঢোকার পর মনে হচ্ছিল, যেন আমি ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ওপর দিয়ে জেটি ব্রিজে হাঁটছি। তখন জোয়ার চলছিল, সেখানকার গাছপালা প্রায় অর্ধেক ডুবে ছিল নাফ নদীর পানিতে। এই সৌন্দর্য বর্ণনা করা এককথায় কঠিন যে এতটাই সুন্দর ছিল। চারদিকে থইথই পানি, জেলেরা মাছ ধরছিল। এই দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। জেটি ঘাটে শেষ প্রান্তে বসে কিছুক্ষণ দোতারাও বাজালাম। আশপাশের মানুষ আমার দোতারা শুনতে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। সবাই বেশ উৎফুল্ল মন নিয়ে দোতারা বাজানো শুনছিল।

জেটি ঘাট থেকে আমি আবার ট্রলার ঘাটে ফিরলাম। সেখানে গিয়ে সেন্ট মার্টিনের জন্য ট্রলারে যাওয়ার টিকিট কাটলাম। সেখানে আমার নতুন এক অভিজ্ঞতা হলো। এই ট্রলারে করেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সেখানকার প্রয়োজনীয় মালপত্র যায়। সেখানকার স্থানীয়দের কাছে থেকে জানতে পারলাম, সেন্ট মার্টিনে তেমন কোনো কিছুই উৎপাদন করা হয় না, সবকিছু টেকনাফ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখানে সবকিছুর দামও তুলনায় বেশি।

ট্রলার ছাড়ল সাড়ে নয়টার দিকে। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রলার নাফ নদী তারপরে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। তখন সমুদ্র বেশ উত্তালই ছিল এবং সুন্দর একটি ঢেউয়ের ছন্দে দুলতে দুলতে ট্রলার সেন্ট মার্টিনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

সেন্ট মার্টিনের কাছাকাছি যখন পৌঁছালাম, তখন চারপাশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। কারণ, এতক্ষণ আমি যে সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিলাম, সেখানের পানির রং এবং সেন্ট মার্টিনের পানির রং ছিল একদম আলাদা– নীলাভ সবুজ। আর আমি দেখছিলাম দ্বীপজুড়েই যেন নারকেলগাছের বন। সে এক অপরূপ দৃশ্য।

অবশেষে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমি সেন্ট মার্টিনে পৌঁছালাম। সেখানে গিয়ে প্রথমে আমি কোস্ট গার্ডের অফিসে নাম এন্ট্রি করলাম। সেখান থেকে গেলাম পশ্চিম বিচের একটা রিসোর্টে। পরিচিতির সুবাদে ওই রিসোর্টে একাই ছিলাম। সেদিন ছিল ২৮ রমজান। সেখানকার স্থানীয় নূর ভাইয়ের আমন্ত্রণে যাই পশ্চিম বিচে তাদের সঙ্গে ইফতার করতে। সূর্যাস্তের সময়ে সমুদ্রের ধারে বসে ইফতার করার যে সুন্দর অভিজ্ঞতা, তা ভোলার মতো নয়। পরদিনও আমি সেন্ট মার্টিনের স্থানীয় বাজারে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ইফতার করি। ইফতার শেষ করার কিছুক্ষণ পর জানতে পারি, ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। তার মানে পরের দিন ঈদ। বাজারের আশপাশে সব মসজিদেই নাকি ঈদের নামাজ সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি ঈদের নামাজ পড়তে চাই একদম সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণে, যেখানে দক্ষিণ পাড়ার মানুষেরা ঈদের নামাজ আদায় করে। সেখানে ঈদের নামাজ পড়লে একটা অন্য রকম ব্যাপার হবে। কেননা বাংলাদেশের একদম সর্বদক্ষিণের ঈদের নামাজ।

ঈদের দিন আমি সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে বের হই দক্ষিণ পাড়ার উদ্দেশে। পশ্চিম বিচের ধার দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে ভোর থেকে সকাল হওয়া দেখলাম। ঠিক আটটা বাজার কিছুক্ষণ আগে সেখানে পৌঁছালাম এবং সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, সেখানে ঈদের নামাজ সকাল ৮টায়। সমুদ্রঘেঁষা টিলার ওপরের একটি ছোট্ট মাঠে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়লাম। কেউ কেউ আমাকে দেখে অবাক হচ্ছিল আর তাদের বাড়িতে দাওয়াত দিচ্ছিল। সবাই এতই আন্তরিক যে আমাকে খুব কম সময়ের মধ্যে আপন করে নিয়েছিল। নামাজ শেষে গেলাম দক্ষিণপাড়া ঘুরতে। সেখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গান বাজছিল এবং গানগুলো ছিল সেই অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায়। সেই গ্রামের মানুষ আমাকে সেমাই ও ডাব খেতে দেয়। তাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঈদের দিনটি আমার দারুণ কাটে সেখানকার স্থানীয় মানুষের ঈদের আয়োজন, উল্লাস দেখতে দেখতে এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

ঈদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও বেশ অর্থপূর্ণ দিন ছিল। ঈদের তৃতীয় দিন গিয়েছিলাম দক্ষিণপাড়ার আব্দুর রশিদ মাস্টার নামের একজন সংগীতশিল্পীর সাথে দেখা করতে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় গান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মধু হই হই বিষ হাওয়াইলা, কইলজার ভিতর গাঁথি রাইখুম তুয়ারে, নারিকেল জিনজিরা আরও অসংখ্য গান। সেদিন পুরোটা দিন আমি তাঁর সঙ্গে গল্প, গান, গানের পেছনের গল্প শুনে শুনে কাটিয়ে দিই।

ঈদের চতুর্থ দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাসে শুনতে পাই, সেন্ট মার্টিনের দিকে একটি ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। আগামীকাল থেকেই এর প্রভাব এই দ্বীপে পড়া শুরু হবে। আমি কোনোভাবেই এখানে আটকা পড়তে চাই না। কারণ, আটকা পড়লে আরও পাঁচ-সাত দিন বা তারও বেশি থাকা লাগতে পারে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, পরের দিনই আমি ট্রলারে করে টেকনাফে ফিরব। সেদিন রাতে সমুদ্রতীরে একটা নারকেল বাগানের মধ্যে মাচার ওপরে শুয়ে সমুদ্র দেখছিলাম। চোখের সামনেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি। আমি দৌড়ে একটা রিসোর্টের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম এবং সেই ঝড়বৃষ্টি উপভোগ করলাম। সেই ঝড়ের রাতের সৌন্দর্যও ছিল বেশ অন্য রকম।

পরের দিন সকাল-সকাল ব্যাগ গুছিয়ে জেটি ঘাটের দিকে যাই। ট্রলার ছাড়বে সকাল ১০টায়। সেদিন আশ্চর্য রকমভাবে আকাশ অনেক পরিষ্কার ছিল, সমুদ্রের পানি ছিল নীলাভ সবুজ। সমুদ্রের পানি এতটাই পরিষ্কার ছিল যে পানির নিচে মাছেদের বিচরণ খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল। আমার মন এক অজানা মায়ায় কাঁদছিল। এই অল্পদিনেই সেন্ট মার্টিনের প্রতি অন্য রকম এক টান অনুভব করছিলাম। সেখানটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিল না। ট্রলারে করে ফিরছিলাম আর সেন্ট মার্টিনে কাটানো সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা ভাবছিলাম।

ছবি: আনস্প্ল্যাশ